সুর পথ পদ্ধতি

একটা লিঙ্ক রেখে সূর্যের সঙ্গে কথা বলাইয়া দিলাম, ৫০ টা গ্রহের সাথে ইন্টার লিঙ্ক রাইখা ফোনের লাইনের মতোন দিয়া, আমি এখানে তার সঙ্গে কথা বলাইয়া দিলাম। সেইখানেও আবার যদি কেও থাকে সেখানে উত্তর দিচ্ছে। সূর্যটা, বডিটাই উত্তর দিচ্ছে, ব্যক্তি হিসাবে কেউ বলছেনা বডির থেকেই সব সময় রেসপন্স্ যেটা হচ্ছে, ঐ রেসপন্ডটাই ল্যাঙ্গুয়েজ হইয়া আসতাছে।
গরুর দুধ ঘাস টিপলেও বাইরায়না, তারে মারলেও বাইরাইবনা, কাটলেও বাইরাইবনা, কি অদ্ভুত ব্যাপার, গরুর দুধটা ঠিক প্রসেস্ অনুযায়ী টানলে পাইবা। বুঝেছ কথাটা ? প্রসেস্ , যেই সব প্রসেস্ সেইটা ব্যবহার করতে হবে। ঠিক সেই রকম প্রসেস্ আছে।
সূর্যের থেকে যে সাউন্ডটা হচ্ছে, সেই সাউন্ডটা নানা রকম ছাকনী দিতে দিতে ভিতর দিয়া আসতে আসতে শেষে যার যার ল্যাঙ্গুয়েজের ভিতর দিয়া কথা বেরিয়ে যাচ্ছে, যেই যেই ভাষায় যার যে ধরন সেভাবেই বেড়োচ্ছে, সুন্দর কথা, মধুময় কথা, জানার কথা।
আর এই সমস্ত কি আমার কাম ? প্রশ্ন ঃ- যদি সূর্যের মাত্রার সঙ্গে এক মাত্রা হয়ে যায় ? উত্তর ঃ- মাত্রা তো হয়ই, নাইলে কি কইরা হইব, ভাল হইব ? সূর্যের মত্রার সঙ্গে এক মাত্রা হইলে তো ভালই, মাত্রা সবারই এক হইতে পারে। ইউনিভার্সএর সব মাত্রার সঙ্গে এক হইয়া যাইতে পারে। সেই জন্যইতো বোঝাবার জন্য মহাকাশটা দিয়েছে, ফাঁকাটা দিয়েছে, এই ফাঁকার সাথে মাত্রা রেখে কাজ কর । ধ্যায়েৎ সূণ্যম অহর্নিসম কথাটা আছে- আকাশের সাথে মাত্রা রেখে কাজ কর । তোমার তো বিষয় বস্তু দেওয়াই আছে, অঙ্ক করতে গিয়া যদি ভুল কর সেটা কার দোষ ? তা নাহলে হুচোট খেতেই হবে । জন্ম যখন নিয়েছ, মাত্রায় না পৌছানো অবধি হুচোট খেয়ে যেতে হবে । কেন ? কিসের জন্য হইতাছে ? কোথার থেকে হইতাছে, কোনটায় কিসে অ্যাসিড হবে, কোথায় অ্যালার্জি হবে ধরা মুশকিল । একটা একটা কইরা বুঝে বুঝে চলতে হবে। তা নাহলে ধরা মুশকিল, এখানে আর অন্য কিছু নাই ।
তবে সেই জন্যই যারা এই পথের পথিক, তত্ত্বের পথের যারা পথিক, তারাই একমাত্র সবাইকে সেই পথে টাইনা নিতে পারবে। এছাড়া এই পৃথিবীর আকর্ষনে যেরকম ৫০-৬০ মাইল থিকাও টাইনা নিয়া আসে, এই রকম এককে টা পরিবেশের আকর্ষণ, অবস্থার আকর্ষণ, আর সব যেই পরিবেশে আছি সবই তো ফ্ল্যাকচুয়েটেড্ চলছে। ফ্ল্যাকচুয়েটেড্ যায়গায় যারা বাস করবে তারা সেই রকমই হবে, বুঝতে পেরেছ কথাটা ?
আগে কাচা খাইতো, তার পরে সিদ্ধ খায়, আরো আগে পোড়াইয়া খাইত, তার পরে আবার সিদ্ধ খাইতে শুরু করছে, অখন মশলা দিয়া রান্না কইরা খাইতাছে। কথাতো একই, পোড়ার থিকা সব ঐ এক অবস্থাই চলছে সব। যা চলছে চারিদিকে এই পরিবেশে, সুতরাং এর থিকা উৎরিয়ে ওঠা। এইটাও একটা পৃথিবীর আকর্ষণের মতন, পরিবেশের আকর্ষণ একটা আছে। এই আকর্ষণ থিকা উইঠা গিয়া দাড়ানোই সবচেয়ে অসুবিধা। সেটার থিইকা দাড়াতে born তত্ত্বজ্ঞ না হলে, এমনে সাধনা টাধনা করে যারা তত্ত্বজ্ঞ হয় সেটার মধ্যে ভেজাল থাকে, গলতি থাকে। রোজগার কইরা

টাকা, আর ডাইস এর সাথে কি কারো তুলনা হয় ? ডাইসএর - সে বড়লোক তৈরী করে, রাজা তৈরী করে, সম্রাট তৈরী করে ডাইস থিইকা। ওতো তৈরী করে, বাণী তৈরী করে। ডাইসের সাথে কারোর তুলনা চলেনা। তুমিতো রোজগার কইরা বড়লোক হইতাছ। এখানে যারা সাধনা কইরা বড়লোক হয় সেই রকম। কেউ তালুকদার, কেউ জমিদার, কেউ রাজা, কেউ মহারাজা সবটাই তো আর্ণ, আর্ণ কইরা করতে হচ্ছে। যে যাই করুক, রোজগার করতে হইতাছে।

আর born যারা ইনস্টিংক্ট যারা born কোয়ালিটি তারা, আরনিংএর কোন প্রশ্ন নাই। তাদের হচ্ছে, তারা হইল ডাইস, তারা ডাইসই রইয়া গেছে। তারা তৈরীই করতাছে। সুতরাং তারা বড়লোক, এই কথা বললে তাদের ছোট করা হবে। সম্রাট এই কথা বললে-- ডাইস কে এইটা হোল ক্রিয়েটার, সে হইল ক্রিয়েটার । এইখানকার বড়লোক, গরীব, ধনী সৃষ্টি করছে সে। তত্ত্বজ্ঞ হল এইখানকার যত আবিলতা যত ফ্ল্যাকচুয়েট চলছে ভিতরে মাত্রার দিক থেকে, সবগুলোকে টেনে নিয়ে চলে যায়। তার তো দাম কষাকষির প্রয়োজন নাই। দাম কষাকষি কাদের ? যারা লিমিটেড। যতই হোক যত লক্ষ কোটি টাকা থাক তবু লিমিটেড, আর ডাইস হইলো আনলিমিটেড প্রোডাক্টস্ , প্রোডাকশান। আনলিমিটেড যে প্রোডাকশান কইরা দিতে পারে তার সঙ্গে কারো তুলনা? তার তো কোন ফেল নাই, ফল্ নাই। born কোয়ালিটিস হইল তার কোন ফল্ নাই, সে দুনিয়ার সবাই কে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। সেই একমাত্র পৃথিবী কিনতে পারে। ডাইস ক্যান ইট। আর নো বডি পৃথিবী কিনতে পারে।
যুদ্ধ কইরা দখল করতে পারে, মাইর পিট কইরা দখল করতে পারে, দখল করা আর একেবারে সহজে কেনা এক না। ডাইস পৃথিবীকে, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র কিনতে পারে, একটা কথার কথা বলছি। কিনতে পারে তার কারন সে অফুরন্ত সে প্রোডাক্ট কইরা দিতে পারে। যার কোন শেষ নাই। আর এই খানকার কোন রাজা মহারাজার পক্ষে এটা সম্ভব নয়। তার সেই ক্ষমতা নাই। আর তত্ত্বজ্ঞই ক্যান এভরিথিং। সে সবাই কে ভাসিয়ে নিয়ে সে চরম মাত্রায়, পরম মাত্রায় নিয়া তাকে রীচ্ কইরা দিতে পারে । এই যে রীচ্ একটা পৌছানো, একটার অর্থ ধনী, রিচ ধনী না ? সেই রিচ। রিচ করে তাকে রীচ্ কইরা দেয়। বুঝতে পারছো ? আচ্ছা--সুতরাং একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব। আর কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়।
আর যারা এখানে বড় হইয়া বসে-বসে সিদ্ধিলাভ কইরা আছে, কতটা সিদ্ধিলাভের পক্ষে সত্য সেতো সন্দেহ জনক, আর যদিওবা হইয়া থাকে, যে তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন ধইরা নেওয়া যায় একটা অবস্থা তিনি প্রাপ্ত হয়েছেন। সেইও লটারী পাওয়ার মতন, অরা অত্যাচার কইরা যেমন হয় সে হয়েছে একটা সাময়িক একটা, সেই জন্য সমুদ্র কেনার মতন দুইটা চাইরটা লোকেরে কইতে পারে তুমি এই পথের পথিক হও, সম্ভাবনা আছে এই টাই যথেষ্ট তাও সন্দেহ জনক।
কিন্তু born যারা তাগো সন্দেহ জনক নয়, তারা একেবারে সবাইকে নিয়া, যত খুশী, তাতো আগেই বললাম আনলিমিটেড, তার ব্যৎসরিক কোন আয় নাই আয়এর কোন প্রশ্নই নাই, তার হইল ব্যয়, ব্যয় করতে দিয়া যাওয়া।
সবাই কে দিয়া যাইব, ওর রিটান, তার আর প্রয়োজন হয় না।
ভক্ত-- সৃষ্টিকর্তা ?

ঠাকুর--- বুঝতে পেরেছ ? সুতরাং সেই তত্ত্বে যারা একে বারে ভর পুর, তত্ত্বই যাদের একমাত্র সম্বল, তত্ত্বই যাদের ধ্যান, জ্ঞান, তত্ত্বই যাদের প্রেম তত্ত্বে যারা ডুবে আছে, তত্ত্বই যাদের দেহ মন, তত্ত্বে যাদের দেহ মন এবং দেহ মন যাদের তত্ত্বে ভরা, তত্ত্বে গড়া, দেহ মন তত্ত্বে ভড়া তত্ত্বে গড়া সেই একমাত্র পারে তত্ত্বে সবাইকে ডুবিয়ে রাখতে বুঝতে পেরেছ ? ধ্যান, জ্ঞান, প্রেম, তার পরে কি ? চক্ষু, কর্ন, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক সব দৃষ্টি যার তত্ত্ব পূর্ণ, তত্ত্বে বিসৃত, তত্ত্বে যুক্ত, তার পক্ষেই সম্ভব তত্ত্বে ডুবিয়ে রাখা, তত্ত্বময় করে রাখা। আর কারো পক্ষে সম্ভব নয় এই তত্ত্বে ডুবিয়ে রাখা।

হিতোপদেশ, নির্দেশ, উবাচ, আর শাস্ত্রের বুলি আওরাইয়া তত্ত্বের বুলি হয় না। সেটা হল এক জনের সম্বন্ধে যেমন গল্পগুচ্ছের কথা আলাপ আলোচনা করা হয়, সেই রকম গল্পগুচ্ছের মতন কথা, গল্পগুচ্ছের কথা এটা তোমার কথা নয়। ওটা হল ঠাকুমার ঝুড়ির কথা, গল্পের ঝুড়ির কথা। শাস্ত্র যদি গল্পের ঝুড়ির মতন কথা হয় সেটা তত্ত্বে ভড়া নয়। শুনতে ভাল লাগে। আর তত্ত্বে ভরা হল যে তত্ত্বময় এবং তত্ত্বে উদ্ভাসিত এবং সবাই কে সেই তত্ত্বে ডুবিয়ে রাখছে, এবং তত্ত্বের মাধ্যমে সবাই কে টেনে আনছে, সেই তত্ত্ব হলো জীবন যাত্রার এক মাত্র সম্বল এবং সেই তত্ত্বেই সবাই এসে মিশে তত্ত্বে ভরে যায়। তা ছাড়া আর অন্য কারোর পক্ষেই নয়।

সেই রকম ব্যক্তিরই অভাব। কাগজের ফুলই বেশী, গাছের ফুল না। বুঝতে পেরেছ ? সুতরাং কি করে হবে। তবু বলছে যে শাস্ত্র পাঠ করলে, মন্ত্র পাঠ করলে তার মধ্যে ফুলের গন্ধ আছেতো, সেন্ট। ফুল অনেক দূরে, গন্ধ আসে এইখানে। সেই রকম কিছুটা যে সেন্ট না পাওয়া যায় তা নয়। সেই সেন্ট মিশে যায় বেশীক্ষন থাকেনা। রাস্তায় গেলে হঠাৎ একবার ফুলের গন্ধ পেলে, পাওয়া যায়না ? হঠাৎ রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে বেশ শেফালি ফুলের গন্ধ পেলে, হেনা ফুলের গন্ধ পেলে, বাঃ ঐটুক পর্যন্তই, ঐ রাস্তার থিকা চাইর পাও গেলেই আবার ময়লার গন্ধ শুরু হইলো। অ্যাঁ-- দূর্গন্ধ শুরু হল। বেশী নয়। তত্ত্বে উদ্ভাসিত সে একটা ব্লুজমস্ ফ্লাওয়ার। এটা হল ঠিক সূর্য্য যেমন উদয় হয়, সব যেমন আলো করে দেয়, হ্যাঁ--ওকে ঢেকে রাখলেও একটা আলো বইতে থাকে। তত্ত্বে উদ্ভাসিত ব্যক্তির ভেতর থেকে এমন একটি আলো, অন্তর ঢালা, বইতে থাকে যার প্রভাবে সবাইকে ডুবিয়ে রাখতে পারে এবং এমন একটি ছোট সূর্যের থালা কত বড় পৃথিবীটাকে আলো করে দেয়। সে যত বড়ই হউক, আমরা তো তাকে থালার মতই দেখি। ওই থালা টুকুনোর ক্ষমতা দেখ দেখিনি সমস্ত পৃথিবীটাকে যেন আলোময় কইরা রাখছে, এই যে পৃথিবীটাকে আলোময় কইরা রাখছে। রাখার যে ক্ষমতাটা ঐ টুকুনো থেকেই তো বার হচ্ছে। কত দূর থেইকা আসছে। তত্ত্ব সেই রকমই একটা উদ্ভাসিত সূর্য। যার আলোকে ভিতরকে আলোকিত করে দেয়। সে যত মনই তখন তার ভিতরে থাকুক, আসলে যে মন বসে যাবে ঠিক তা নয়। অনেকের ধারনা যে মন বুঝি বসে যাবে, অনেকেরই একটা প্রশ্ন থাকে মন বুঝি স্থির হয়ে যাবে, মনে বুঝি চঞ্চলতা আর থাকবে না। সবটাই থাকবে, ২০০ মাইল স্পীডে যদি যায় ঘন্টায়, সে কি ধূয়া পান করে না ? সে কি বাথরুম করে না ? সে কি খাওয়া দাওয়া করে না ? সে কি খেলা ধুলা করে না ? এদিকেতো ২০০ মাইল স্পীডে দৌড়াচ্ছে, সেতো ২০০ মাইল স্পীডএই দৌড়াচ্ছে সাথে সাথে, স্পীডের সাথে সেও দৌড়াচ্ছে। দৌড়ানোর ভিতরে গতি তো তার ঠিকই আছে। তার মধ্যে আবার মনের দিক থেকে তার চঞ্চলতাও ঠিক আছে। তোমাকে তত্ত্বে ডুবিয়ে রাখছি, ডুবিয়ে যদি নেইও তাতে

তোমাদের বিক্ষিপ্ততা যে গিয়ে স্থিরতা এসে পড়বে তা কি করে আশা কর ? সেখানে বিক্ষিপ্ততা থাকবে, চঞ্চলতা থাকবে নানা রকম মন এদিক ওদিক যাবে, সব কিছু ভাববে, কিন্তু তত্ত্বের গতির গাড়ীর মধ্যে তুমি বসে আছো। গতির সাথে তুমি কিন্তু চলছ। এদিকে আবার যত রকম ঝঞ্ঝাট মনের চাঞ্চল্যতা সবটাই আবার পুরোপুরি আছে তাতে তুমি মনে করনা তোমার বুঝি লস হয়ে গেলো। তোমার ধারনা এদিকে বইসা গেলেই বুঝি একটা কিছু উপলব্ধি করবে। উপলব্ধি কথাটা হচ্ছে মানুষের কথার কথা। এইটা উপলব্ধিতে বুঝি ডুবে যাবে। একেবারে দর্শনে বুঝি ডুবে যাবে। ওগুলো কোন কথা না। দর্শন হইছে একটাই। যা দেখছ এইটাই দর্শন, যা বুঝছ এটাই অনুভূতি যা উপলব্ধি করছ এইটাই অনুভূতি। কিন্তু তুমি, তত্ত্বে যখন তুমি ভাসতে থাকবে তোমার গতি কিন্তু তত্ত্বে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। যখন তোমাকে পৌছিয়ে দিল তত্ত্বে, তখন ওই সবগুলি থাকতাছে। মনের সব ক্লেদ গুলো তোমার থাকতাছে। থাকতাছে বলে ওগুলো ভ্যালুলেস হয়ে যাচ্ছে, তার কারন ওগুলি কোন কাউন্টেবল নয়, কারন তুমি এত স্পীডে চলে গেছো ওগুলির আর কোন প্রশ্নই আসে না। প্রয়োজনই আসে না, ওগুলির কোন দামই নাই। ওগুলো থাকবেই, এই বাসা থাকবেই, যতক্ষণ মন আছে এগুলো থাকবেই এইগুলো দূর হয় না কখনো। দূর হয়না বলে যে হবেনা তা না, তুমি তো গতির সাথে চলে যাচ্ছ। যখন তুমি পৌছলে তখন তুমি বোঝলে যে না আমি পৌছে গেলাম । তখন এই গুলো আর তোমার নেই, মুছে গেল। শ্লেটে লেখলা জল দিয়া মুছে ফেললা ব্যস, মুছে গেল। এখন তোমাদের যে গতি চলছে, তত্ত্বের সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধ, তত্ত্বের ইঞ্জিনের সাথে বগী তোমার বেঁধে দিতে হবে, বগীর মধ্যে তো গদ্দামালই থাকে যত গদ্দামাল, ইঞ্জিনের সাথে তোমাদের গতি, ইঞ্জিন যেখানে পৌছল বগীও সেইখানে পৌছল ব্যস হইয়া গেল। এই জন্যই বলছি তত্ত্বের বিশ্লেষণ, বিশ্লেষণ মূখী হতে হবে এবং তত্ত্বের বিষয় বস্তুর সাথে তোমাদের যুক্ত হতে হবে। ঐ প্রচেষ্টা টা তত্ত্বের শিকলের সাথে যুক্ত রেখে তোমার চলতেই হবে এবং চলার জন্য একটা প্রচেষ্টা, তার জন্য আলাদা কোন রকম বুদ্ধি খাটাতে হবে ন। আলাদা কোন রকম কিছু খাটাতে হবে না, শুধু সহজ ভাবে তত্ত্ব গুলোকে স্মরন কর। স্মরন করলেই যথেষ্ট, স্মরনেই তো সব হচ্ছে। যত যা কিছু মনের ফ্ল্যাকচুয়েট সবই চলছে স্মরনে, বরনে, ধরনে, গরনে সবই চলছে কিন্তু, তাই তত্ত্বের সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করলে আর কোন ভাববার মতন কিছু থাকে না। এইটাই একমাত্র পথ, বাঁচার পথ, জানার পথ, চলার পথ এবং শেষ পথ, থাক। আমি যেই ভাবে নানা দিকে জড়িয়ে পড়ছি, জড়াইয়া ফেলছে আমারে, আমি নিজে জড়াতে চাইনা, একটুও জড়াতে চাইনা, আমার কোন দিক থেকে কোন কিছুর উপরে আমার এখানে লোভও নাই, প্রলোভনও নাই, আশা-আকাঙ্খাও নাই। কিন্তু আবার যেই সব প্রয়োজন বোধ করি, তার সাথে মিশে কথা বলে চলে যাচ্ছি। কিন্তু এদিকে তার জন্য নিজের দেওয়ার মতন ছিল, সুযোগ সুবিধার অভাবে হইয়া ওঠছে না, সেখানে আমি কি করব বল।

তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে যে আমারে খালাস করে, আমাকে একটা নিরিবিলিতে রাখা। তা নাহলে বাছুরও ছাড়া, বানও ছাড়া, বাছুড়ে দুধ খাইয়া ফালায় সব। আমাকে সারাক্ষন যদি আবিলতার মাঝে রাখ ঐ আবিলতার কাজেই আমি থাকব। আমারে যেই কাজে রাখবা--বাটনা বাটার কাজে রাখবা, বাটনাই বাটুম বইয়া বইয়া, এই সংসারের কাজে লাগাইবা সংসার ধর্ম করুম, চাউল বাছতে কইবা চাউল বাছুম, আমি না করিনা।

কিন্তু কথা হইল তার মধ্যে এই গুলো তো চলছে। বহু বছর বহু কাল থেইকা, একটা জীবনে চালাইয়া যাচ্ছে সবাই, পরপর তো আসছে, তার চেয়ে কিছু তো থাকা দরকার, নতুনত্ব থাকা দরকার। সবচেয়ে হল সার কথা, যে এই বিশ্বপ্রকৃতির উদ্দেশ্যর সাথে আমারে যুক্ত করা। সৃষ্টির উদ্দেশ্য টা আজও সঠিক ভাবে বার হয় নাই। মনে মনে দন্দ্ব রয়ে গেছে অনেক, যেখানে দন্দ্ব রয়ে গেছে সবারই, সেইখানে যত প্রমানই আসুক, প্রামান্যতা লাভ করে নাই। আমি চাচ্ছি যে এই উদ্দেশ্যের সাথে যুক্ত হয়ে আমাদের কাজ করা, সেটাই আমার প্রধান কাজ। উদ্দেশ্যর সাথে এক করে, তার উদ্দেশ্যর সফল করা। তার উদ্দেশ্য সফল করা এটা আমার কাজ।

প্রকৃতি যা চান আমরা তাই যেন করতে পারি, এটাই হল আমার কথা। সেই ভাবে করতে গেলে পথে সেই পথে চলতে হবে, সেই মতে চলতে হবে, সেই ধারায় চলতে হবে, তার জন্যই এই সব গুলো। চলতে গেলেই তত্ত্বের দরকার, তত্ত্ববিনে বাঁচবেনা, সৃষ্ট বস্তুর সাথে যুক্ত হয়ে থেকে, তাদের ভিতরকার উদ্দেশ্য গুলো, ভিতর কার তত্ত্ব গুলো, ভিতর কার তথ্য গুলো জেনে তোমাদের জানিয়ে রাখতে চাই। এই টাই দরকার।

চোক্ষের সামনে সূর্য দেখতাছ কত কুটি বছর। একবার চেষ্টা কইরা দেখি সূর্যের সাথে কি ভাবে যুক্ত হওয়া যায়, আলাপ করা, তোমরাতো সুর্যের সঙ্গে সব সময়ই যুক্ত হয়ে আছ, সুতরাং তার সঙ্গে যুক্ত হইতে কোন অসুবিধা হবে না। যার সঙ্গে আমরা যুক্তই আছি সব এবং সর্ব অবস্থায়, তার সঙ্গে যুক্ত হইয়া তার ভিতরের সব কিছু আমাদের জানার পথে কোন অসুবিধা হবে না। সেটাই ভালোভাবে, যাতে সুষ্টভাবে জানাতে পারি বা পারা যায়। তার জন্য আর একটু চেষ্টা করে দেখব কতটা সফল করতে পারি।

টাইম শর্ট, এখন সেই ভাবে একটু প্রস্তুতি না নিলে তো আর টাইমের বেড় পাবনা। এখন আমি যদি মিটিংএর মোহে, লোক জনের মোহে, নানা রকম মোহে বা মায়ায় পরে যদি আমরা সরে যাই, না চলি, তাইলে তো এই ঝঞ্ঝাটের মধ্যেই আমাদের সময় কেটে যাচ্ছে, আর বেড় পাব না, অন্য কাজ করার পক্ষে অসুবিধা হচ্ছে, দিন দিন জটিলতায় আমাদের ঘিরে ধরছে। সুতরাং এর চেয়েও বড় কাজ হল আমাদের নিরবে থেকে তার চেয়ে বেশী কাজ করে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া। খালি জানিয়ে দেওয়া এটা সেই তুলনায় খুবই ছোট, আরও আমরা বৃহৎ চিন্তায় বৃহৎ কাজে এগিয়ে যেতে চাই, এবং তাতে এই সমস্ত গুলো ত্যাগ করতে হবে।

(গান গায় শ্রুরকরেঃ---মায়ার বাধন-ছাড়া কি গো যায়।)

বুঝতে পেরেছ যে কথাটা বলি।

(মায়ার বাধন ছাড়া কিগো যায় । আমি যাই--যাই মনে করি চলিতে না পারি মহা-মায়া
আমার পিছনে ধায়-------- ।।।)

হাত পা ভাঙ্গা-বাধাঁ-গলা নাই ভেঙ্গে গেছে আর পারছিনা, বুঝতে পেরেছ ? যেই অর্থ নিয়ে এরা গান গাইয়া থাকুক না কেন-অর্থটা আমাদের জীবনের প্রতি ক্ষনে তাই তো হচ্ছে, আর কিছুতেই তো ঠেলে ফেলতে পারছি না, এক্কেবারে আকরাইয়া ধরছে চাইরদিক থেইকা ওরা, অক্টোপাসের মত। তাই ওই ভাবেই আমাদের চলতে হবে।

(গান শ্রুরকরেঃ-- না ছাড়িলে----- কোটি জনমের হলে ভাগ্য গৃহ ছেড়ে হয় বৈরাগ্য --নানা---)

ঐ যে বৈরাগ্য, এই বৈরাগ্য নয়। গেরুয়া পরে নয়। কোটি জনম হলে ভাগ্য, বহু জনমের ভাগ্য

কথাটা কেন বলেছে ? যে বিষয় ছেড়ে হয় বৈরাগ্য। বৈরাগ্যতা না আসলে এই কাজ করা সম্ভব পর হয় না। সেই ভাগ্য বান, যে সব কিছুর ভিতর থেকে, সব কিছু কে বাদ দিয়ে, যে সত্যি কারের বৈরাগ্য ধর্ম অবলম্বন কোরে ত্যাগের ধর্ম অবলম্বন করে, সেই সত্যি কারের এগিয়ে যেতে পারে, এগিয়ে যাবে, সেই হইল ধার্মিক।

তা নাহলে এই ভাবে আমাদের তো ত্যাগ করতে বলে নাই। আমরাতো সংসার ছেড়ে দিয়ে যেতে চাই না, সংসার রাখতে চাই। যতটা রাখা দরকার ততটুকুনি করা উচিৎ, তোমাদের তো অবস্থা যা, জটিল অবস্থা, কিছুতেই তো গুছাইয়া উঠতে পারছ না। আকড়িয়ে ধরেছে। আমি যে কোন মুহুর্তে চলে যেতে পারি। সেটাই তো দরকার। যাক। থাক ।

শ্রীশ্রী ঠাকুরের ছাত্র জীবন

পারিজাত অযথা আমার উপরে রাগ করলো, রাগ করলো, তার কারনে পারিজাত অর দলে টানতে চেয়েছিল, আমি সেই দলে না গিয়া ওদের দলে গেছি, কিন্তু দল হিসাবে যাই নাই, আমি গেছি সবাইর সঙ্গে মেলা মেশা করার জন্য। তার জন্য পারিজাত আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করল, কথা বন্ধ করার ফলে আমি ডাকি কথা বলে না। আমি পারিজাতদের বাড়ী গেলাম, বাড়ীতে গিয়ে ঘড়ে গেছি পারিজাত কাঠের কারখানায় কাজ করে কাজের ঐখানে বইসা রইছে, আমি উইঠা কাড়ে উইঠা গেছি গিয়া। পারিজাতকে জরাইয়া ধরেছি, পারিজাত কিছুতেই কথা বলবে না।আমি বলি তুই যদি কথা না বলিস আমি তোকে ছাড়বো না, কথা বলতে হবে, তার পরে শেষে হেসে দিয়েছে, শেষে কথা বলেছে।

তার মানে দেখা গেল এই ভাবেই তোমাদের সাথে ভুল বোঝাবুঝি হয়। এবং তারা পয়ত্রিশ জনের মধ্যে চৌত্রিশ জন, আমি ছাড়া চৌত্রিশ জন, সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেছে যে, খাতার ভিতরে একমাত্র তোমার খাতাই সুন্দর, সব চেয়ে মহান, সব চেয়ে উদ্দেশ্যপূর্ণ আর আমাদের সব গুলো কুৎসিত। কারন আমরা মার কথা শুনিনাই, বাপের কথা শুনিনাই, আমরা অবাধ্য পানা করেছি, না জানিয়ে পয়সা নিয়েছি। তারা ইচ্ছামত যে যা খুশি করেছে।

আর কি করেছি আমি, বললাম কারো পাকা চুল তুলেছি পয়সা-- হরকিত ঠাকুরের পাকা চুল বেছেছি এত পয়সা পেয়েছি, স্বরজুর পিঠ টিপে দিয়েছি এত পয়সা পেয়েছি, আশু মজুমদারের তামাক ভইর‍্যা দেওয়াতে খুশি-হইয়া আমাকে পয়সা দিয়েছে, তার পরে সূর্য ঠাকুরের একটা জিনিষ বাজার থেইকা এনে দিয়েছি সে আমাকে এক পয়সা দিয়েছে, সেই পয়সা গুলো জমিয়ে মাকে বলি নাই, মা দুঃখ পাবেন বলে, আমি যে এই ভাবে পয়সা এনেছি মাকে বলিনাই, কিন্তু পয়সা দেখে আমি মাকে বলেছি, মা, তোমার কিছু আনতে হবে ? মা বলেছে তুই পয়সা পাবি কোথায় ? কি বল কি আনব, মা যা-যা বলতেন, যমুনা সাবান, দুধের ছাঁকনী, ঐ পয়সা দিয়া মার সংসারের যদি একটু লাঘব করতে পারি, সেই চেষ্টাই আমি সব সময় করতাম। তারপরে বাবায় জিজ্ঞাসা করলেন তুই এই পয়সা কোথায় পেলি ? তখন বাবার মনে যদি কোন একটা খট্‌কা জাগে যে, ছেলে পয়সা কোত্থেকে জোগাড় করলো, আমি বাবাকে তখন বললাম, আমি বলতে পারি আপনি মনে কিছু করবেন না ? দুঃখ পাবেন না ? রাগ করবেন না ? আগে যদি বলেন তাহলে আমি বলতে পারবো।

তুই বল আমি কিছু রাগ করবো না।

বলছি হরকিত ঠাকুরের পাকা চুল বেছে দিয়েছি,তাতে আমায় পয়সা দিয়েছে, সূর্য ঠাকুর একটা বাজারের আদেশ করছিল সেটা এনে দিয়েছি তাতে পয়সা দিয়েছে, তার পরে সরজুর পিঠ টিপে দিয়েছি মাথা টিপে দিয়েছি তাতে আমায় পয়সা দিয়েছে, তার পরে আশু মজুমদারের তামাক ভরে দিয়েছি তার পরে হাট বাজার করেছি বাজার থেকে ডুলা টা আমার হাতে দিয়েছে আমি এনেছি তাতে পয়সা দিয়েছে, বাবায় না ফ্যাল ফ্যালাইয়া আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সেই পয়সা দিয়ে তার পরে কি করেছি দুধের ছাকনী আনতে বলেছেন, যমুনা সাবান আনতে

বলেছেন, সেই সব তা এনেছি।
বাবা বললেন আমার কিছু বলার নাই, কি রকম ভাবে তাকাস সংসারের প্রতি। আমি তো অক্ষম, অক্ষম পিতা পেয়েছিস, কি করব, তোরা এই ভাবে করছিস, কি ভাবে সংসারের দিকে, কোন ছেলে করে না।
বাবা আপনি তো অসন্তুষ্ট হননি ?
না আমার দুঃখ লেগেছে যে আমার ছেলে আমার সংসারের জন্য কত দূর নেমেছে !
না বাবা, তাতে আমি রোজগার করেছি এটা আমার গৌরব, আমি ভিক্ষা চাইনি বাবা, আমি দান চাইনি, আমি যা করেছি খেটে করেছি, পরিশ্রম করে নিয়েছি, তাতে তো আমার মনে হয় আমি গৌরব বোধ করছি।
হাঁ তুই করতে পারিস গৌরব বোধ, আমি বাপ হিসাবে শুনে আমার কত খারাপ লাগতে পারে, আর তো কোন ছেলে এরকম করবে না। কোন ছেলে করবেও না, দিলে বলবেও না, আর করবেও না।
আমি এই ভাবে লিখতাম আর চৌত্রিশ পাইত্রিশ জন আমরা ছেলে যা ছিলাম একলগে তারা শুনত, শুনে শুনে বলত বাবা তুই যা করিস, এই ভাবে আমরা করতেও পারবোনা, বললে তো আমরা রাগই করে বসব, চটেও যাবো, আমাদের তো পয়সারও দরকার তখন আমরা এদিক ওদিক করতাম, কিন্তু এই যা করছিস সেটা করতে পারব না।
এইভাবে মেলায় পয়সা দিত, টুকটাক টুকটাক, এই কাছাড়ীর থেইকা, ওই কাছাড়ীর থেইকা, সব বাবার সহকর্মীরা ওই নায়েবরা যা দিত, সেই পয়সা দিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করতাম মা তোমার কি আনতে হবে ? মার জিনিষ পত্র এনে আমি খাতা-কলম কিনতাম, কাগজ কিনতাম, কিনা টিনা রাখতাম, ওই পয়সা দিয়া চলতাম। একটি পয়সাও এদিক ওদিক করতাম না। ইচ্ছা হইত মাঝে মাঝে ছোলা ভাজা তার পরে একটু কিছু খেতে ইচ্ছা করত। কিন্তু এক পয়সা যদি নষ্ট করতাম, নষ্টই তো হয়ে যেত। ছোলা ভাজা নাই খাইলাম, মার একটা জিনিস কিনে দিলে মার সাহায্য হবে, সংসারের সাহায্য হবে, সেই হিসাবে আমি এক পয়সাও খরচা করতাম না।
এই এক পয়সা বাচানোর জন্য ধোলাই--গঞ্জ ষ্টেশন থেকে দয়া-গঞ্জে আসতাম, সেই পোলটা পাড় হয়ে। সে যে কতবড় risk কত বিপজ্জনক। গাড়ী এসে----বিরাট ফাঁক ফাঁক, নিচে বিরাট খাল, তিন,চার,পাঁচ তলার মতন উঁচু। সেই খাল পাড় হয়ে এক পয়সার জন্য, তখন মাঝে মাঝে দুঃখ হত, একটা পয়সা বাঁচাবার জন্য আসছি যদি এই সময় গাড়ী চইলা আসে ? তবে তো আর বাঁচবার পথ নাই। তবু ওই এক পয়সা বাঁচিয়ে যদি কিছু মার জন্য নিতে পারি, সংসারের জন্য কিছু কিনে নিতে পারি, সেই চিন্তা করে ভাইয়ের কাছে যাইতাম, মামা বাড়ী যাইতাম।সাথে থাকতো তয় তরকারি, মাছ, ডুলা-টুলা, ঘি ইত্যাদি। এই বোঝাই করে নিয়ে যেতাম, নিয়ে গিয়ে ভাইদের টা ভাইরে দিতাম, মামার গুলা গুছিয়ে সেই গুলি দিতাম। সেই কত কষ্ট করে এই সবগুলি করতাম।
তাই মনে করে এইসব গুলি জিনিস যখন যা কিছু ঘটনা ঘটত খাতাটা সাথে করে নিয়ে যেতাম দূরে, সব লিখতাম, গয়না কইরা গেলাম, এই ভাবে গেলাম, সমস্ত কথাগুলা লিখতাম। লিখে আবার বসে বসে সবাইর টা সবাই পড়তো। পড়ে আবার নিজেদের মধ্যে চৌত্রিশ জনে লিখতাম।

কে কি করে, কে রাগ করল, কতবার কে কার উপড়ে রাগ প্রকাশ করল, আমার যতগুলো রাগ আমি প্রকাশ করেছি-দূঃখ, সবগুলো দূঃখই প্রকাশ করছি। পারিজাত আমাকে অযথা ভুল বুঝেছে সেটা আমার দূঃখ লেগেছে। আমি তো পারিজাতের উপড়ে রাগ করি নাই। রাখাল অযথা আমার সাথে রাগারাগি করেছে, আমার সাথে কথা বন্ধ করেছে। রাখালের সাথে আমার একটুও অর উপড়ে রাগ নাই, মনে দূঃখ নাই, রাখাল কথা বললে আমি খুশি হব। রাখালের কাছে আর একবার যাব। রাখাল তারিয়ে দিলেও আবার রাখালের কাছে গিয়ে বসব, রাখাল নিশ্চই তখন আমার সাথে কথা বলবে। এইটা লিখে দিয়েছি, এইটা তো গেল। ওকে বার বার কইরা বলেছি-- অমুল্যকে--তুই রাগ করিস না, তুই ভুল বুঝিস না, এই। কেউ পয়সা নিয়েছে কেউ রাগ করেছে, ওরা বেশীর ভাগই মার কথা শোনে না।

কিন্তু আমি আমার খাতার মধ্যে একটা মূহুর্ত নাই যে মার অবাধ্যপনা করেছি, বাবার অবাধ্যপনা করেছি, ভাইয়ের অবাধ্যপনা করেছি, কোন গুরুজন যারা বয়সে বড় কারও অবাধ্যপনা করেছি। এটা আমার একেবারে প্রতিজ্ঞা ছিলো কারো অবাধ্যপনা করব না, কারো উপড়ে আমি রাগ করব না, তারা যত আমার উপড়ে রাগ করুক, আমি তাদের উপড়ে রাগ করব না। এটা আমার প্রতিজ্ঞা ছিল সেই প্রতিজ্ঞা আমি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করে গেছি। সে জন্য আমার উপরে অনেকে চটে গেলেও পরে আবার ঠিক হইয়া গেছে।

সেই ভাবে তোমাদের কথা বলি সবাইরে। এই রকম মন যদি তোমাদের প্রতেকের থাকে কত সুন্দর অভিভুত হয়ে যায়। শিশু বয়স থেকাই এক ধরনের কাজ, এক ধরনের চিন্তা মানুষ করতে পারে না। কত ছেলেরে আমি পড়াবার ব্যবস্থা কইরা দিতাম, নিজের বই নাই, বই থাকলেও বইয়ের পাতা নাই, পুরানো বই নতুন বই কেনার মতন সামর্থ ছিল না। কিন্তু অন্যদের পড়াবার জন্য কত সাহায্য সহযোগিতা করেছি। কি ভাবে পড়লে পাস করবে সেগুলো বলে দিতাম তাদের উন্নতির চেষ্টাই ছিল আমার একে বারে অন্তর ঢালা ভালবাসা।

নিজের দিকে যখন তাকাই তখন অভাগার মতন বইসা থাকতাম। আমায় যদি কেউ দুইটা টাকা মাসে দিত, তাইলে আমি নিশ্চই ভাল রেজাল্ট্ করে বেড়োয়ে যেতে পারতাম। কার কাছে বলব, কে বলবে, কে শুনবে কথা আমার। তখন টাকার মূল্য--জিনিষের মূল্য এত সস্তা, টাকাটার মূল্য এত বেশী। ৩টা টাকা যদি কেউ মাসে সাহায্য করত তবে আমি একেবারে ঢাকা কলেজ, ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভিতরে আমি একটা সাড়া ফেলে দিতাম। কিন্তু আর হল না। স্বরস্বতী মনে হয় আমার দিকে তাকাইলই না, লক্ষ্মী মনে হয় সরে গেলেন, আমি কি করব বল ? কার কাছে চাইব ? বাবা যা পান তার কাছে চাওয়াও যায় না, চাইতে গেলে বাবার সেই দূঃখের মুখটা দেখলে আর তাকাতে ইচ্ছাকরে না বাবার দিকে। বাবায় ভীষণ ব্যথা পান, মাসে স্কুলের বেতন দিতে পরেন না।

চুপ করে বসে থেকে বড়োই গাছ ছিল, কুল গাছ তলায় বইসা থাকতাম, যাওয়ার সময় বসতাম, ফেরার সময় স্কুলে জিজ্ঞাসা করত আমাকে পড়াটা দেখাইয়া দেই কি পড়া পড়েছে ওরা--ওরা জিজ্ঞেস করত, তুই এখানে বইসা আছিস কেনো ? বইসা আছি কেনো ? সেইটা তদের কাছে কি বলব, তরা বুঝতেও পারবি না আর বলতেও ইচ্ছা করে না। তার পরে জল ভেঙ্গে ভেঙ্গে গিয়ে স্কুলের মাষ্টারকে--পড়াবেন বললেন, সেই কত দূর, জল ঠেঙ্গিয়ে কত কষ্ট করে, রাস্তায় জল

ভাইঙ্গা সেই গ্রামের রাস্তায়, তার পরে বন, লতা পাতা, গাছ গাছরা তার পরে বিরাট এক ঝোপ, তার মধ্যে প্যাচাইয়া একজন, সেই অবস্থায় ফিরতাম, তখন পন্ডিতেরে ধন্য মনে করতাম, মাষ্টার মশাই আমাকে পড়াচ্ছেন। সেই কটা দিন যখন যা পড়িয়েছেন সেই পড়া পড়ে আমি এমন ভালো রেজাল্ট্ করেছি মাষ্টার হাঁ করে গিয়েছে, নিবারণ মাষ্টার মশাই ছিলেন অভিজ্ঞ যিনি অ্যালজ্যাব্রা লিখেছিলেন অঙ্ক করিয়েছেন, নিবারণ বাবু বলেছিলেন আমি অনেক ছাত্র পড়িয়েছি, অনেক ছাত্র দেখেছি, তোমার মত এইরকম সুদক্ষ, বিচক্ষন, বুদ্ধিমান, বিবেচনা সম্পন্ন দেখিনি। তোমার পড়া হবে কিনা জানি না, তুমি যদি পড়ে যাও ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীতে একটা নতুন কিছু দিয়ে যেতে পারবে। এটা আমার ধারনা, ম্যাথামেটিসিয়াণ হয়ে তোমারে আমি যা বুঝেছি, আমি তোমাকে তাই বললাম। কিন্তু তোমার যা অবস্থা দেখতে পারছি পড়তে তুমি পারবে কিনা সেটা আমার সন্দেহ রয়ে গেছে।

সত্যি তাই নিবারণ বাবুর কথাটাই সত্যি হল, আমার পড়া হলো না। এতবড় পড়ার আগ্রহ থাকা সত্বেও আমার সামনে বিজয় সোম, বিনয় সোম এরা রাত্র ভইরা পড়তাছে, ওই দিকে ঋষিকেশ, কেশব ওরা পড়তেছে, সবাইর পড়া কানে আসতেছে। আমি বই নিয়া বসে আছি, বইয়ের পাতা নাই, গল্প নেই, লিখে যে আনবো সে অবস্থাও আমার তখন ছিলনা। আমি তখন পুরানো পড়াগুলি অন্য গল্পগুলি পড়ি, কিন্তু ইংরাজী দেখাবার লোক ছিল না, শেখাবার লোক ছিল না কার কাছে যাব ? কে শেখাবে ? কে বলবে ? এই করে করে এদিকে সংসারের কাজের চাপ এসে পড়ে গেলো, জলটানা, কাপড় ধোয়া, ঘর মোছা, বাসন মাজা, বাজার করা, সংসারের কর্তব্য রক্ষা করা সবগুলি এক এক করে করে করতাম। কোন কাউকে বলতাম না, নীরবে সব করতাম, নিরবে সব সহ্য করতাম।

সকলের কাজের ভার নিতাম ভার নিয়ে তারা যে খুশি হত আমার উপর, ভার দেওয়ায় তাতে আমি তৃপ্তি পেতাম আমি সব সময় নিজে কারো উপরে একটু অসন্তুষ্ট হউক, মনঃক্ষুন্ন হউক সেটা আমি চাইতাম না। কিন্তু যতই কাজ করি, ইচ্ছা মতন আমাকে চাপ দিয়ে বলত বোকা তো ? চাপাইয়া দিয়া গেলাম। ও বুঝবে না বোকা মানুষ ওর কান্ধে চাপাইয়া দিলে করে দেবে এইভাবে করে আমার কাছে চাপাইয়া দিতো, আমি কিন্তু খুশী হতাম, আমাকে তো বোকা ভেবে গেছে--যাক গিয়া খুশী তো হয়েছে, নির্ভরতা করেছে, আবার এই কথাও বলতো ওকে কাজের ভার দিলে ও ঠিক করে রেখে দেবে ফাঁকি ঝুঁকি সে দেয় না, এইটুকুনি আমার ছিলো। এই রকম করে করে আমার জীবনের তরী ভাসিয়ে দিয়েছি। এতোটুকুনু আমি ব্যতিক্রম করি নাই, কখনো কারো ক্ষতি করিনি, সব সময় মঙ্গল চিন্তা করেছি, প্রত্যেকের শুভ চিন্তা করেছি।

কিন্তু তোমাদের এখানে এসে এই অবস্থায় পরে আমি প্রতি মুহূর্তে হোঁচট খাচ্ছি, ব্যথা পাচ্ছি, আঘাত পাচ্ছি কিন্তু তার প্রতিদানে তোমাদের উপরে এমনে আমার কোন ব্যক্তিগত রাগ নাই। রাগ হচ্ছে, জীবনের ভুল বোঝা বুঝিতে দুঃখ হয়।

এখানে যা কিছু তোদেরে মার ধোর করি, যা কিছু করি, আমার নিজের দুঃখকে লাঘব করার জন্য। ওরা কি ভাবে তৈরী হবে না হবে জানি না, ভুল করে এত ভুল বোঝে, এত অল্পেতে আঘাত পায়, এত অল্পেতে মনঃক্ষুন্ন হয়, এত অল্পেতে অভিমান হয়, এত অল্পেতেই হইয়া যায়, যারা কোন বিচার করে না। একটু নিজের কাজ হয়নি বলে, নিজের কাজ পরিপূর্ণ হয়নি বলে নিজের

কাজটুকু হয়নি বলে, এতবড় রাগ করে ফেললো সারা দিন সব কাজের মধ্যে সেই অভিমানের সুর, মেজাজের সুরটা বোঝা যায়। আমার তাতে কোন কিছু হয়না। আমি যেই বিষয় বস্তুর মধ্যে সেই রাগ করতাম রাগ আসলে পরে দুঃখ হত সেটুকু পর্যন্তই শেষ তার পরে তাদের উপরে আমার রাগটুকু থাকতো না।

এই ভাবে সকলে মিলে আমাকে খুব ভালবাসতো।পরে আবার সবাই ভাল বাসতো। প্রথমে যাই বোঝে বুঝুক পরে কিন্তু আমার উপরে সবাই নির্ভর করত বুঝতে পরেছ ? তোমরাও সেই ভাবে চল, চললে দেখবে সেই ভাবে ভালো লাগবে এর চেয়ে আন্দের কিছু নাই।

ভক্ত-- পঁয়ত্রিশ জন এটা কি দোগাছির তো ?

বাবা--হ্যাঁ দোগাছিতে ছিল, আবার দেশেও চৌত্রিশ-পৌত্রিশ জন ছিলাম। ইসে কৃষ্ণনগরে করেছিলাম।

ভক্ত-- স্কুলে না পাঠশালায় ?

বাবা-- না স্কুলে, পাঠশালায়, গ্রামে মিশে টিশে করেছি। আবার মেদিনীমন্ডলেও কিছু ছিলাম। কিন্তু সব চেয়ে আমি অদেরই বেশী ভালো পেয়েছি। হেনা, শেফা ওরাই সব চেয়ে, আমাদের চেয়ে ভালো হয়ে গেছিল। ওরাই সব চেয়ে বেশী মেডেল পাইয়া গেছে। আমিও তাদের কাছে হার মাইনা গেছি। ওদের মনের অবস্থা দেখে এরকম আমি মাঝে মাঝে ঠাট্টা করতাম, আমি পর্যন্ত শেষে বলেছিলাম তোমাদের কাছে আমি হার মেনেছি বাবা--তোমাদের তুলনা হয় না, কি সুন্দর তোমরা, খুব ভালো লাগছে। ভক্ত-- এই যে মাইনে দিতে পারতে না, স্কুলের নাম কি কাটা যেত ? বাবা-- না ভক্ত-- তার পরে যখন ভরতি হতে তখন ? বাবা-- মাষ্টার মশায়রাই গুছিয়ে টুছিয়ে নিতেন। দুইমাস, চাইর মাসের বাকি থাকত মাষ্টাররাই দিয়া দিতেন। আবার কিছু এই সমস্ত কইরাই গোছাইতাম। দুই পয়সা--চার পয়সা--এক পয়সা কইরা কইরা। একটা বাঁশ রাখছিলাম বাঁশের মধ্যে ফুটা করে ফেলে দিতাম, এক পয়সা-দু পয়সা করে করে ধর পাঁচ টাকা হইল পাঁচ টাকা দিয়া দুই মাসের মাইনা ধর তিন-চাইর মাসের মাইনা এরকম দিয়েছি। বাবাকে কষ্ট দিতে চাইতাম না। যেই ভাবে পারি মনে কর একটা যায়গায় যাইতে দিত পয়সা, সেইখানে হাইটা যাইতাম গিয়া। তার থিকা হয়তো দশ পয়সা বাচলো বা দুইআনা বাচলো এই রকম কইরা খুব কষ্ট করেছি মোটমাট। ভক্ত-- এমনিতে মায়না কত ছিলো ক্লাশ এইটে ? বাবা-- একটাকা বারোআনা, দুইটাকা বারোআনা ছিল বুঝি নাইনের, আড়াই টাকার মতন ছিলো মনে হয়। আড়াইটা টাকা দিতে হইব এইটাই পারলাম না আগে দিছি। একটাকা, পাঁচসিকা ঐটা কোনমতো কইরা চালাইয়া গেছিলাম যখন নাকি আড়াই টাকার মধ্যে পইরা গেলো মায়না সেটাই আর দিতে পারলাম না ভক্ত-- আড়াই টাকা তখনকার দিনে অনেক টাকা ? বাবা-- তখন এই রকমই ছিল।